এই সময়
সংবাদপত্র

* কথাসরিৎ *

পৃথিবী নিজের ধুলোমাটির জন্যে ভারি অপ্রতিভ হয়ে পড়ে আছে। কী করবে, বেচারার নড়ে বসবার জায়গা নেই।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিরাশ্রয়

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান। এই তিনটি ক্ষেত্রে নাগরিকদের কী পরিস্থিতি তা দিয়েই যে কোনও দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিচার করা যেতে পারে। এর মধ্যে ভারতীয় নাগরিকদের বাসস্থানের পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় যে তথ্য উঠে এসেছে তা কোনও দ্রুত হারে উন্নয়নকামী দেশের পক্ষে শোভন নয়। উদ্বেগের বিষয় হল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিষয়টি তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে উল্লেখ করলেও তা নিয়ে এ পর্যন্ত যথেষ্ট আলোচনা শোনা যায়নি। এক কথায় দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ পাকা প্রকৃত অর্থে নিরাপদ বাসস্থানের সুবিধা থেকে আজও বঞ্চিত। সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী দেশের অন্তত ৪০ কোটি মানুষ হয় খড় বা পাতার ছাউনি দেওয়া ছাদের বাড়িতে বসবাস করতে বাধ্য হন। অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের পাকা ছাদের বাড়ি নেই। ঠিক তেমনই প্রায় ৪০ কোটি মানুষ যে বাড়িতে বাস করেন তার দেওয়াল ইঁটের তৈরি পাকা দেওয়াল নয়। গ্রামের মানুষদের ৬০ শতাংশ এমনই বাড়িতে বাস করে থাকেন। স্বাভাবিক ভাবেই এই বাড়িগুলিতে বাস করা বিপজ্জনক। বিশেষত পূর্ব ভারতের মত যে সব অঞ্চলে বর্ষার প্রকোপ বেশি সেখানে প্রায় প্রত্যেক বর্ষাতেই এই ধরনের বাড়ি ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্যোগের সময় প্রায়শই এই ধরনের বাড়ির লক্ষ লক্ষ বাসিন্দা সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হয়ে পড়েন।

দেশের শহরগুলিতে অবস্থা কিছুটা উন্নততর হলেও, তাকে কোনও অবস্থাতেই আদর্শ বলা যায় না। সমীক্ষায় উঠে আসা তথ্যে দেখা যাচ্ছে, দেশের তিন-চতুর্থাংশ মানুষ এক বা দুই কামরার বাড়িতে বাস করেন। ভরতে একটি পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা পাঁচ। এক বা দুই কামরার বাড়ি যে পাঁচ জন মানুষের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয় তা সহজবোধ্য। বিশেষ উদ্বেগের বিষয় হল ২০০১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে এই পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। শহরে বাসস্থানের মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, সেই তুলনায় নাগরিকদের রোজগার না বাড়া এবং যথেষ্ট সহজ শর্তে গৃহনির্মাণ বা ক্রয় করার ঋণ না পাওয়াই শহরবাসীর একটি বড়ো অংশের কাছে সঠিক মাপের বাসস্থান না থাকার প্রধান কারণ। দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা, আমেদাবাদের মত শহরে বিগত কয়েক বছরে বাড়ির মূল্য প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই দরিদ্রদের পক্ষে তো বটেই, এমনকী দেশের বিপুল সংখ্যক মধ্যবিত্তের পক্ষেও উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত মাপের ও মানের বাড়ি কেনা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছে। সেই কারণেই ভাড়া বাড়িতে বাস করা পরিবারের সংখ্যার পরিমাণ ২০০১ সালের ১.৫ কোটি থেকে বেড়ে ২০১১ সালে ২.২ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। নির্বাচন আসে যায়, নতুন সরকারও গঠিত হয়, অথচ স্বাধীনতার সাতষট্টি বছর পরেও কেন বাসস্থানের মতো মৌলিক বিষয়ে এই সব সমস্যার সমাধান করা যাচ্ছে না, এই প্রশ্নটি নিয়ে এবারে যথেষ্ট চর্চার সময় এসেছে।

অনৈতিক

মানবজাতির বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য যদি কাউকে সবটুকু ছেড়ে দিতে হয়, অনবদ্য আত্মত্যাগের পথ ধরতেও হয়, তবে তাতে বিন্দু মাত্র দোষ নেই। ক্ষুদ্র কোনও স্বার্থের ঠাঁই তো এখানে নেই-ই, উল্টে এই ত্যাগকে উন্নীত করা উচিত প্রাথমিক কর্তব্যের পর্যায়ে। প্রচলিত রীতি ও আদর্শ বাণী এমনই। কিন্তু সে আত্মত্যাগ কখন যেন অম্লানবদনে বলিদানে রূপান্তরিত হয়ে যায়, খেয়ালই থাকে না। গত পনেরো বছর ধরে, আমেরিকার অর্থ সাহায্যে, এ দেশে এক পরীক্ষা চলেছে, যা বোঝার চেষ্টায় ব্রতী, যে সার্ভাইকাল ক্যান্সারে ভোগা কোনও মহিলাকে যদি বিনা পরীক্ষায় রাখা হয়, সে ক্ষেত্রে রোগের প্রকোপ তাঁর শরীর ও আয়ুর উপর কতটা পড়ে। কিন্তু এই মহা-যজ্ঞ চলাকালীনই, অন্তত ২৫৪ জন ভারতীয় মহিলার মৃত্যু হয়েছে, যাঁরা আবার পরীক্ষককূলের নিয়ন্ত্রণ দলের অন্তর্গত ছিলেন। যা সাংঘাতিক চিন্তার কারণ, এবং একই সঙ্গে এ প্রশ্নও তুলে দেয়, যে এমন কাণ্ডকে কি আদৌ আত্মত্যাগ বলে এড়িয়ে যাওয়া যায়, নাকি তাকে সরাসরি বলিদান হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত? আরও মর্মান্তিক তথ্য এই যে, নিয়ন্ত্রণ গ্রুপের প্রায় ১,৪০,০০০ মহিলাকে কখনওই এই পরীক্ষা বিষয়ে কিচ্ছু জানানো হয়নি। অর্থাৎ তাঁরা প্রকৃত অর্থে গিনিপিগ, বা সাদা ইঁদুর। যাদের উপর 'বৃহত্তর মানব স্বার্থের' খাতিরে এন্তার পরীক্ষা চালানো যায়, সে যতই মারাত্মক হোক না কেন, আর কাজ ফুরোলেই, যাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যাওয়াটাই নিয়মে পরিণত। সার্ভাইকাল ক্যান্সার বা এমন অন্যান্য কঠিন অসুখের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে, অবশ্যই নানা প্রকার পরীক্ষা প্রয়োজন, আরও স্পষ্ট করে বোঝার জন্য, যে কী ভাবে তাকে ঠেকানো সম্ভব। কিন্তু সেখানে যদি চিকিৎসা ও গবেষণা ক্ষেত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিয়ম অগ্রাহ্য করা হয়, এবং সামান্য মানবিকতারও ধার না ধরা হয়, তা হলে এমন কাজকে অনৈতিক বলা ভুল হবে না।

আসলে ভ্রান্তি তো আরও গভীরে। এবং ধোঁয়াশাও। এই ২৫৪ জন মহিলার মৃত্যু অদ্ভুত এক পরিস্থিতির সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গিয়েছে মানবজাতিকে। তারা অ্যাদ্দিন গিনিপিগদের এমত অবস্থায় দেখে অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু আজ ভাগ্যের এমনই ফের, যে তারা নিজেরাই গিনিপিগ-সম হয়ে উঠেছে। এবং নিজেকে সে রূপে দেখে, বিস্তর বিচলিত হচ্ছে। বোধ হয় এই প্রথম টের পাচ্ছে, অমন অসহায় পরিস্থিতিতে পড়লে, গিনিপিগদের ঠিক কেমন লাগতে পারে। সভ্যতার যাদের অঙ্গুলিহেলনে চলে, তারা অন্য কারও উপর অসহায়ত্বের বাঁধন গলাতেই পারে, কিন্তু সে বাঁধন যখন সভ্যতার চালকরা নিজ-প্রকারের গলায়ই ছড়িয়ে দেয়, তা বিস্ফোরক। তা উদ্বেগজনক। তা আরও বৃহৎ বিনাশের আগাম জানান। অনগ্রসরের পর্যায়ে রয়ে গিয়েছেন যাঁরা, তাঁদের সুপরিকল্পিত ভাবে শোষণ করে গিয়েছে তাঁরা, যাঁদের হাতে সর্বদাই থেকেছে শক্তির রাশ, ইতিহাস তাই দেখায়। কিন্তু শোষণ যখন আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে সরাসরি বলি দেওয়ায় বিশ্বাসী হয়, তখন শেষের পরিণতি নিয়ে আশঙ্কা জাগে।

* অসংখ্যা *

১৭৭৩০০০

(সতেরো লক্ষ তিয়াত্তর হাজার) — ভারতে সম্পূর্ণ গৃহহীন মানুষের সংখ্যা। ২০১১ সালের আদম সুমারির হিসাব অনুযায়ী।

* দিনকেদিন *

২২ এপ্রিল

১৮৪০: জেমস প্রিন্সেপ প্রয়াত হন।
১৮৭০: ভ্লাদিমির লেনিন জন্মগ্রহণ করেন।
১৯৫৭: ডিভিসি কলকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ আরম্ভ করে।
১৯৭০: 'বসুন্ধরা দিবস' পালন শুরু হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

নগর কলকাতা রূপসী হচ্ছে কিন্তু পূর্বের বিপর্যস্ত জলাভূমি?

আজ বসুন্ধরা দিবস। শহর সবুজ করার ডাক উঠবে। কিন্তু শহরের প্রান্তে সবুজের যে অনন্য ঐতিহ্য মৃত্যুর মুখে, তাকে বাঁচাবে কে? প্রশ্ন তুললেন **ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ**

২২ এপ্রিল বসুন্ধরা দিবস। এ বার আওয়াজ উঠেছে শহর সবুজ করার। কলকাতার পুবে এখনও সবুজ আছে কিছুটা। আমার অনেক দিনের পরিচিত জায়গাও বটে। তবে যাওয়া হয়নি বহুকাল। মেট্রোপলিটান বাইপাসের বেড়া ডিঙিয়ে, ধাপা-মানপুর মৌজার দুর্গাপুর গ্রামের মাঝে গিয়ে তাই দাঁড়িয়েছিলাম। খুব অল্পই আমার আগের দেখা গ্রামের সঙ্গে মিলছিল। দেখলাম কোথাও কোথাও ঘন বসতি, পাকা দেওয়াল কিংবা টালির ছাত। চমৎকার পিচের রাস্তা। বিদ্যুৎ। প্রায় উপনগরীর চেহারা নিয়েছে। আশেপাশে চাষও আছে। রাস্তা ভালো হতেই পারে। জমির মালিক কর্পোরেশন আর সর্বক্ষণ ময়লা বোঝাই লরি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। রাস্তা হতেই হত। কিন্তু কথা বলে জানলাম এখানে জমি হস্তান্তর হচ্ছে। অবাকও হতে পারলাম না। সাদা কাগজে না-দাবি দলিল সই করে চাষি তার বংশ পরম্পরায় বাস করা ভিটের জমি দালালকে দিয়ে দিচ্ছে। সেখানে নবাগতরা বাড়ি করছে। ইটের দেওয়াল। কোনও বোঝার উপায় নেই কার জমি, কেই বা হস্তান্তর করছে আর কারাই বা পরম ভরসায় নতুন করে দখল নিচ্ছে। তা-ও আবার সর্বক্ষণ পৌরসভার আধিকারিকদের নাকের ডগায় বসে। এ সবই আমার একেবারে গুলিয়ে গেল।

পাঠক হয়তো ভাববেন এত অল্পতে আমার গোলাচ্ছে কেন? এমন তো কতই হচ্ছে। হয়তো হচ্ছে কিন্তু ধাপার জমির ইতিহাস অত্যন্ত বিশিষ্ট। বস্তুত অবিভক্ত বাংলার আমল থেকে তিনটি জমি ছিল যেখানে সরকার খাজনা পেতেন না। প্রথমটি হল কালীঘাটের মন্দির প্রাঙ্গণ। দ্বিতীয় হল মুর্শিদাবাদের নবাবের খাস মহল সম্পত্তি আর তৃতীয়টি হল ধাপার মাঠ। এদের বলা হত 'ক্রাউন গ্রান্ট'। এহেন ধাপার জমি কেনাবেচা হলে অবাক তো হওয়ারই কথা।

১৮৭৮ সালে মেটকাফ সাহেব কলকাতা কর্পোরেশনের দায়িত্ব নেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি শ্রীযুক্ত ভবনাথ সেনকে ডেকে পাঠান এবং কলকাতার জঞ্জাল আর ময়লা জলের সাহায্যে চাষ করার অনুরোধ করেন। এবং জায়গা হিসেবে ধাপার ২০০০ বিঘে জমি (এক বর্গমাইল) শ্রীযুক্ত সেন দীর্ঘমেয়াদি ইজারার মারফৎ হস্তান্তরিত করেন। সাহেব আগে থেকেই জানতেন যে শ্রীযুক্ত সেন বিহারে বাঁকিপুরের কাছে নদীর চরে, যেখানে শহরের জঞ্জাল ফেলা হত, সেখানে তরিতরকারির চাষে সফল হয়েছিলেন। কিছু কিছু কথা ডক্টর অজয়কুমার সেনের একটি অপ্রকাশিত লেখায় জানতে পেরেছি। এই ভাবেই শুরু হয়েছিল ময়লা জল আর শহরের জঞ্জালের উপর সবজির চাষের অসামান্য নজির। আমার জানা নেই পৃথিবীতে কোথাও পুনর্ব্যবহারের এমন বিজ্ঞানসম্মত কোনও দৃষ্টান্ত আছে কি না। ভাবতে বিস্মিত হতে হয় যে গত শতাব্দীর শুরু হবারও আগে শহরের জঞ্জাল আর ময়লা জলের সমন্বয়ে যে কৃষিপদ্ধতি আবিষ্কার করলেন তা নিয়ে আমাদের কোনও আলোচনা নেই, গর্ব নেই, শ্রদ্ধা নেই। নতজানু হয়ে সাহেবদের দেখানো ওয়েস্ট রিসাইক্লিং-এর পাঠ দুলে দুলে মুখস্থ করছি।

আমারও হয়তো জানা হত না কিছুই, যদি না '৮০'র দশকের গোড়ায় রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের অনুরোধে একটি দায়িত্ব ঘাড়ে না চাপিয়ে নিতাম। কী করে কলকাতার ময়লা জল পুনর্ব্যবহার করা যায় এর খোঁজ করারই দায়িত্বই আমায় দেওয়া হয়েছিল। কেউ তখনও জানতেন না যে এর উত্তর শহরেরই পুব দিকের জলাভূমিতেই লুকিয়েছিল।

সেই খোঁজেই আমি ধাপার মাঠে এসে পড়েছিলাম। পর পর সুন্দর ঝিল তখনও ছিল। মাছ চাষ হত, আর তারই জলে সেচ হত ঝিলের পাশের ক্ষেতগুলিতে। কর্পোরেশনের ফেলে দেওয়া ময়লা জমির ধারে জড়ো করে এক অভিনব পদ্ধতিতে কম্পোস্টিং করার ব্যবস্থা চালু ছিল। খোঁজ নিতে নিতে পৌঁছেছিলাম শ্রীযুক্ত সেনের কর্মকাণ্ডে। সমস্ত ব্যবস্থাই তাঁর আবিষ্কার। সবাই বলেছিলেন।

একটা ছড়া ছিল। আমি শুনেছিলাম কিন্তু ভুলে গিয়েছি। তবে তার কথাগুলি এই ছিল যে একুশ দিন ধরে রাখার পর ঝিলের জল সেচের জন্য ব্যবহার হবে। ছড়াটার বয়স পঞ্চাশের বেশি। সমস্ত ক্রান্তীয় দেশে ময়লা জল আবদ্ধ জলাশয়ে একুশ দিন ধরে রাখলে যে পরিশোধন পর্ব সম্পন্ন হয় তা যে কোনও সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের থেকে ভালো। মতামত: স্যানিটেশনের উপর সর্বাধুনিক ইংরেজি পুস্তিকা। অথচ ভবনাথ সেনকে আমরা কেউ চিনি না।

সে সময়, অর্থাৎ আমি যখন প্রথম গিয়ে পড়ি, আমার দেওয়ার ব্যাপারটা অর্থহীন। কিন্তু আড়াই দশকের মাঝামাঝি, আমি যখন ধাপায় যাতায়াত করতাম তখন প্রায় প্রত্যেক প্লটেই শহরের জঞ্জাল ঢিবি করে পড়ে থাকত। খুব যখন প্রয়োজন হত চালকরা ময়লা উল্টে দিয়ে ৩০-৩৫ টাকা আনন্দ ভাতা আদায় করতেন আর তা দিতে অনেকের ঘটিবাটি বন্ধক পড়ত। কিন্তু সার তৈরি হত ময়লা থেকেই। খুব কমই বাড়তি সার ব্যবহার করা হত। পদ্ধতিটি খুব পরিপাটি ছিল। তখনও ঝিল সব সজীব ছিল। যোগাযোগ থাকত খালের ময়লা জল ঝিলে ঢোকার জন্য।

অনেক বছর বাদে, ক'দিন আগে যখন ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, কথা বলছিলাম, তখন ঝিলগুলো খুব বিপর্যস্ত অবস্থায় মনে হল। খালের ময়লা জলের সঙ্গে পাইপ লাগানো ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। জলের অভাবে অনেক ঝিল শুকিয়ে গেছে। বুকের উপরে কলমি শাকে ভরে গেছে। জলের রং অনেক ক্ষেত্রে কালো আর কয়েকটা হয়তো জঞ্জালে ভরাট হয়ে গিয়েছে বা হচ্ছে। যাদের সঙ্গে কথা হল তাদের মধ্যে অনেকের মাঝেই একটি অনিশ্চয়তার হতাশা সহজেই ধরা পড়ে। অনিশ্চয়তা অমূলক নয়। এই বিষয়ে কলকাতাবাসী হিসেবে কয়েকটি প্রশ্ন আসে। এর উত্তর এড়িয়ে গেলে অনেক জট পাকিয়ে যেতে পারে।

প্রথম প্রশ্ন হল, এই যে হাজার দু'য়েকের উপর চাষি আজও আছেন যারা চাষও করেন বাসও করেন— তাঁদের ওখানে রাখার কোনও পরিকল্পনা আছে কি না? বড়ো কথা এই যে, এই জমি সম্পূর্ণ ভাবেই কর্পোরেশনের জমি এবং সাদা কাগজে যাঁরা কেনাবেচা করছেন তাঁদের কর্মকাণ্ডে আইনের কোনও জোর নেই। তাঁরা বেআইনি কাজ করছেন। কিন্তু কেনাবেচা চলছে। তাই খুব স্পষ্ট করে জানতে হবে এই চাষিরা ভবিষ্যতে এই জমিতে থাকবেন কি না? যদি থাকেন তবে তাঁদের ভোগ দখলের অধিকার দেওয়া হবে কি না— আর দেওয়া হলে কী ভাবে। যদি ঠিক হয় এখানে চাষিরা থাকবেন না কারণ জমি কখনওই তাঁদের ছিল না বা এখনও নয় তবে তাঁরা কোথায় যাবেন? কোথায় গিয়ে তাঁরা, তাঁদের ছেলেমেয়েরা, বসবাস করবেন? উচ্ছেদের প্রশ্নে দেশে এখন স্পষ্ট আইন আছে।

> সমগ্র ধাপা আবার র‍্যামসার স্বীকৃত জলাভূমির এলাকার মধ্যেও পড়ে। কোনও পরিবর্তন করতে হলে আন্তর্জাতিক কনভেনশনকে জানিয়ে করতে হবে।... সেচ দপ্তরের জমির উপর জঞ্জালের অপ্রচলিত শিল্পের ঠেলায় ময়লা জলের প্রধান খালটাই আক্রান্ত। এ সমস্তই র‍্যামসার দপ্তরকে জানাতে হবে।

একটা খটকা লেগেছিল। এখানকার চাষিদের কোনও চাষের অধিকার খুঁজে পাইনি। দপ্তরে আলোচনা করে দেখলাম কিছু করতে গেলে প্রথমে দরকার জমির উপর দখল নিয়ে কারা আছেন এবং কতটুকু করে জমি চাষ করছেন তার একটা তালিকা। ন'টা গ্রামে আঁতিপাঁতি করে খুঁজে যত দূর পারা যায় জমির ধারে ধারে বসে কে কে চাষ করছেন তার তালিকা আমরা প্রস্তুত করেছিলাম। তখন তিনটি রাজনৈতিক দল ধাপায় প্রভাব বজায় রাখত। তার মধ্যে প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি বা পি এস পি নামক একটি দলও ছিল। মোট কথা ২৪৯০ জন দখলদার কৃষকের নাম এবং তাঁদের চাষ করা জমির পরিমাণ রিপোর্ট আকারে ছাপা হয়েছিল। তার পর তৎকালীন মেয়রের করকমলে সমর্পণ করেছিলাম। আশা ছিল কৃষকদের প্রাপ্য অধিকার পাওয়ানোর ক্ষেত্রে। যদি কয়েক ধাপ এগোনো যায়। মাননীয় মেয়র রিপোর্টটি দেখে বলেন যে কনসালটেন্ট-এর কথা শুনতে তিনি বাধ্য নন। রাজ্য পরিকল্পনা পরিষদ তাঁর কাছে কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠান! এর পর কাজটা আর এগোয়নি।

ধাপার চাষিদের কর্পোরেশন আর ময়লা দেয় না। এ বার যাঁরা প্রথম বার ভোট দেবেন তাঁদের কাছে এই দেওয়া-না

এর পরের প্রশ্ন হল ধাপার জমির ব্যবহার এবং ঝিলগুলির কী হবে, তাই নিয়ে। ঝিলের অনেকগুলি শুকিয়ে গিয়েছে। বুঁজে গিয়েছে, হারিয়ে গিয়েছে। এখানকার জমির ব্যবহার এবং ঝিলের অবস্থার কোনও পরিবর্তন মাননীয় উচ্চ আদালতের সম্মতি ছাড়া করা যাবে না। ১৯৯২ সাল থেকে এই রায় বলবৎ আছে। সমগ্র ধাপা এলাকাটাই এই জলাভূমির রায় যে সীমানা চিহ্নিত করেছিল তার মধ্যে পড়ে। একই কারণে সমগ্র ধাপা আবার র‍্যামসার স্বীকৃত জলাভূমির এলাকার মধ্যেও পড়ে। কোনও পরিবর্তন করতে হলে আন্তর্জাতিক কনভেনশনকে জানিয়ে করতে হবে। সারা ধাপা জুড়ে বিরাট বিরাট কড়াইতে করে চামড়ার ছাঁট ফোটানো হচ্ছে, ধোঁয়ায় মানুষ অভ্যস্ত হতে বাধ্য। সেচ দপ্তরের জমির উপর প্রায় ৬০-৭০ টি জঞ্জালের অপ্রচলিত শিল্পের ঠেলায় ময়লা জলের প্রধান খালটাই আক্রান্ত। (সেচ দপ্তর অবশ্য নীরবতা পালন করাই উচিত ধর্ম বলে মনে করেন) এ সমস্তই র‍্যামসার দপ্তরকে জানাতে হবে। ভারত সরকার জলাভূমি বাঁচানোর ক্ষেত্র এই ভাবেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কোনও কিছুই চতুর্দিকে না জানিয়ে করা যাবে না। এ সিদ্ধান্ত কেবল পৌরসভার চৌহদ্দির মধ্যে নিয়ে নিলে বিধিভঙ্গের অপরাধ হবে।

কলকাতার পশ্চিম রূপসী হয়েছে। সকলেই আমরা গর্বিত। আশা করতেই পারি কলকাতার পুবে যে সবুজের অনন্য নজির আছে আমরা যার যত্ন করতে পারিনি, সেই যত্ন ফিরে আসবে। কৃষক তাঁর ঐতিহাসিক দক্ষতার প্রতিষ্ঠা পাবেন। পুবের কলকাতাও অহঙ্কারে মেতে উঠবে। বসুন্ধরা দিবসে আমরা এমনই একটা অঙ্গীকার করতেই পারি।

লেখক 'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার'-এর বিশেষ উপদেষ্টা

কতকথা

আদবানি বেরিয়ে যান, আদানি সঙ্গে আসুন— বিজেপি-র এখন এমনই পরিস্থিতি। এ থেকে স্পষ্ট ওই দল কতটা মরিয়া এবং ক্ষমতা-লোভী হয়ে উঠেছে।

রাহুল গান্ধী

শিল্পপতিদের সঙ্গে বিজেপি-র যোগাযোগ প্রসঙ্গে

আমি দেশের সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত আর কংগ্রেস মোদী নামক সমস্যাটির সমাধানে ব্যস্ত।

নরেন্দ্র মোদী

কংগ্রেস তাঁকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করছে, এই অভিযোগ তুলে

সাংবাদিকরা ইচ্ছে করে আমার সময় নষ্ট করার চেষ্টা করছেন।

লালুপ্রসাদ যাদব

নির্বাচনী প্রচারের সময় সাংবাদিকরা বার বার সাক্ষাৎকার চাওয়ায়

আপনারা তো এটা কিনলে সেটা ফ্রি— এমন বিজ্ঞাপন দেখেই থাকেন, আমি বলছি আমায় ভোট দিলে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ফ্রি।

রেণুকা রাওয়াত

কংগ্রেস প্রার্থী ও উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হরিশ রাওয়াতের স্ত্রী

নির্বাচনী প্রচার ভাষণে

* বোধিবৃক্ষ *

গুরু সরহপার কাহিনি

অলকা চট্টোপাধ্যায়

জাতিতে ব্রাহ্মণ।... তবুও বুদ্ধের ধর্মে তাঁর শ্রদ্ধা হলো। আচার্যদের কাছে ধর্ম শ্রবণ করে গুহ্য মন্ত্রের ধর্মে তাঁর বিশ্বাস জাগল। তখন তিনি ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ এই উভয় সম্বর রক্ষা করে দিনে ব্রাহ্মণ ও রাতে বৌদ্ধধর্মের নিয়ম পালন করতেন। ব্রাহ্মণরা সকলেই জানতে পারলেন যে তিনি মদ্যপ। তাঁরা সমবেত হয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দেবার জন্য রাজা রত্নফলের কাছে আবেদন জানালেন। 'আপনি রাজা, ধর্মের নিয়মকানুন যে লণ্ডভণ্ড করে তাকে দেশে থাকতে দেওয়া কি সঙ্গত? রোলি দেশের পনেরো হাজার নগরের মুখ্যব্যক্তি এই সরহপা কিন্তু মদ্যপান করে, ইনি অধঃপাতে গেছেন, এঁকে তাড়িয়ে দিন।'

রাজা বললেন, 'পনেরো হাজার নগরের প্রধান যিনি তাঁকে বিতাড়িত করা সমীচীন হবে না।' এই বলে রাজা সরহের কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনি ব্রাহ্মণ, মদ্যপান করা কি আপনার পক্ষে সঙ্গত?' সরহ বললেন, 'আমি মদ্যপ নই। সব ব্রাহ্মণ আর লোকজনদের একত্র করুন আমি শপথ নেব।'

সকলকে সমবেত করা হলে সরহ বললেন, 'যদি মদ্যপ হই, তাহলে আমার হাত পুড়বে, যদি না হই তাহলে পুড়বে না।' এই বলে ফুটন্ত ঘি-এর মধ্যে হাত রাখলেন, কিন্তু হাত পুড়ল না।

রাজা বললেন, 'ইনি কি সত্যই মদ্যপান করেন?' ব্রাহ্মণরা একত্রে বললেন, 'সত্যই পান করেন।'

জ্বলন্ত গলিত তাম্র পান করেও মদ্যপায়ীর কিছু হলো না।

ব্রাহ্মণরা আবার সমস্বরে বললেন, 'তবুও উনি মদ খান।'

'যদি জলে প্রবেশ করলে ডুবে যাই, তাহলে আমি মদ্যপ, যদি না ডুবি, তাহলে নই।'

অন্য এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে দুজনে জলে নামলেন; ব্রাহ্মণ ডুবে গেলেন, কিন্তু সরহ ডুবলেন না।

সরহ বললেন, 'আমি মদ্যপ নই।'

সরহ তখন বললেন, 'আমাকে তুলাদণ্ডে ওজন করা হোক। ভারী হলে আমি মদ্যপ নই, হাল্কা হলে মদ্যপ বলে প্রমাণ হবে।'

সেই মতো একদিকে এক মানুষের সমান ওজনের বাটখারা পরপর তিনটি দিয়ে অন্যদিকে সরহকে বসিয়ে ওজন করা হলো। সরহ ভারী হলেন।

তখন রাজা ঘোষণা করলেন, 'এরকম ক্ষমতা যাঁর আছে, তিনি যদি মদ্যপান করেন তো করুন।'

এই বলে রাজা ও ব্রাহ্মণরা সকলে তাঁকে প্রণাম করে উপদেশ প্রার্থনা করলেন।

* প্রতি সম্পাদক *

ভোটার কি জানেন কাকে ভোট দিচ্ছেন?

আমাদের সংবিধান প্রণেতারা অনেক অনেক স্বপ্ন দেখিয়েছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যাঁদের দিয়ে ওই সব স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার কথা তাঁদের নির্বাচিত হওয়ার মানদণ্ড এত সাধারণ রেখেছেন যে 'সোনার হরিণ' হয়তো কোনও দিনই ধরা দেবে না। গত ৬০ বছরে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার সিকিভাগও যাঁরা পূরণ করতে পারেননি তাঁদের নিজস্ব প্রাপ্তি লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চার হাজার থেকে আশি হাজারে পৌঁছে গিয়েছে আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে অন্যান্য সুযোগ সুবিধে।

সংবিধান রচিত হবার সময় পঞ্চায়েতিরাজ চালু ছিল না। তাই বোধ হয় সংবিধান প্রণেতারা সকল শ্রেণির নাগরিককে বিধানসভা ও লোকসভার মাধ্যমে 'দেশ সেবার' সমান সুযোগ করে দিতে নিয়ম কানুন কিছুটা শিথিল রেখেছিলেন। আর সেই 'দেশ সেবার' সুযোগ নেবার জন্য দাঙ্গা, হাঙ্গামা, খুন, খারাপি, বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট ইত্যাদির মাধ্যমে অনেকেই হৈ হৈ করে ভোটের ময়দানে নেমেও পড়ে ছিলেন। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।

এখন তো পাঁচস্তরীয় শাসন ব্যবস্থা চালু হয়ে গিয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের কাজের পরিধি ও দায়িত্ব আর একজন লোকসভার সদস্যের কাজের পরিধি ও দায়িত্বের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত। কিন্তু ন্যূনতম যোগ্যতার কোন পরিবর্তন করা হয়নি। কার স্বার্থে কখনও ভেবে দেখেছেন কি? এর ফলে যা যা হওয়া সম্ভব তাই তাই হচ্ছে। এর জন্যে আপনি কাকে দোষ দেবেন?

গণতান্ত্রিক সরকার হবে 'জনগণের, জনগণের জন্য আর জনগণের দ্বারা'। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলছে। পাঁচ বছর অন্তর কয়েক মুহূর্তের জন্য এক বার সুযোগ আসে ভোটদান করার। তার পর নীরব দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করে যাওয়া ছাড়া জনগণের আর কিছু কি করার থাকে? ক্ষোভ আছে কিন্তু বিক্ষোভ জানাবার সুযোগ কোথায়? সমস্ত ক্ষমতা প্রত্যক্ষ ভাবে চলে যায় সরকার যাঁরা চালাবেন তাঁদের হাতে আর পরোক্ষ ভাবে রাজনৈতিক দলের হাতে। এই বিচ্যুতির দায় কে বা কারা নেবেন বলতে পারেন?

> 'দেশ সেবার' সুযোগ নেবার জন্য দাঙ্গা, হাঙ্গামা, খুন, খারাপি, বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট ইত্যাদির মাধ্যমে অনেকেই হৈ হৈ করে ভোটের ময়দানে নেমেও পড়ে ছিলেন। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।

বেশির ভাগ ভোটারই জানতে আগ্রহী নয় যাকে ভোট দিচ্ছে তিনি সেই পদের জন্য উপযুক্ত কি না? যে দলের হয়ে প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন সেই দলের রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি কি? 'ব্লাইন্ড ভোটিং'-এর মারাত্মক কুফল গত ৬০ বছর ধরে ভোগ করেও আমাদের চৈতন্য হয়নি যে ভোটপ্রার্থীদের পুরো ঠিকুজিকুষ্ঠিটা জেনে নিয়ে ভোট দিই। রাজনৈতিক দলগুলি ভোট প্রক্রিয়াকে একটা উৎসবের রূপ দিয়ে ভোটারদের বিপথে চালিত করছে। নির্বাচন কমিশন ভোট দিতে ভোটারদের উৎসাহিত করছেন ঠিকই কিন্তু যোগ্য প্রার্থী খুঁজে নেবার ব্যাপারে কী কী করা উচিত সে ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোনও রকম সক্রিয়তা দেখাননি।

সরোজকুমার মুখোপাধ্যায়, কলকাতা ৩১

ভুল তথ্য

'প্রতি সম্পাদক' কলমে 'উত্তর আধুনিকতা'য় (১০-৪) একটি ভুল তথ্য উল্লেখিত হয়েছে। 'বৃষ্টির একপাশে উড়ছে' কাব্যগ্রন্থের লেখক গোলাম রসুল ইংরেজি সাহিত্যে এম এ নয়, বাংলা সাহিত্যে এম এ হবে। বিষয়টি আপনার নজরে আনছি।

গোলাম রসুল। সাঁতরাগাছি, হাওড়া ১০৪

অত্যন্ত নিন্দনীয়

স্কুল সার্ভিস কমিশন কর্তা অমিতেশ বিশ্বাসের নকল চাবি তৈরির খবর (৯-৪) পড়ে খুবই বিস্মিত হলাম। তিনি যে কারণে নায়ক থেকে খলনায়ক হলেন, সে ব্যাপারকে সঠিক ও যথার্থ প্রমাণ করার পূর্বেই নিজের চরিত্রের রূপ প্রকাশ করে দিলেন। তাঁর প্রকাশ করা দুর্নীতি যেমন সরকারকে কঠিন চ্যালেঞ্জে ফেলেছে, তেমনই ডব্লিউ বি সি এস কর্তার বরখাস্ত হওয়ার পরে নিজে অফিসে প্রবেশ করতে না পারার জন্য নকল চাবি তৈরি করে প্রবেশ করাটা অফিসারোচিত চরিত্রের সম্মান হানিকর হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে।

লক্ষ লক্ষ চাকুরিপ্রার্থী পরীক্ষার্থীর জীবন এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে, হাইকোর্টের রায়ের দিকে চাতক পাখির ন্যায় চাকুরিপ্রার্থীরা তাকিয়ে আছে। এমন অবস্থায় এস এস সি-এর দুর্নীতি, অফিসারের নকল চাবি তৈরি করে অফিসে প্রবেশ, অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই পরিস্থিতির দায় তো সরকারকেই নিতে হবে, এবং সরকারকেই উপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্যা-সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে করে সাধারণ বেকার যুবক-যুবতী পরীক্ষার্থীরা নিজেদের জীবনের সঠিক দিশা পেতে বাধার সম্মুখীন না হয়।

আবু হানিফ, ফুরফুরা, হুগলি

চিঠি লিখুন এই ঠিকানায়— **প্রতি সম্পাদক**, এই সময়, বেনেট কোলম্যান অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড, ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, নবম তল, ৪১ এ, এজেসি বোস রোড, কলকাতা ৭০০০১৭ | ফ্যাক্স: ০৩৩-৬৬০৩১৩৭৮ | ই-মেল: eisamay@timesgroup.com

নিজের মত জানান ফেসবুক-এ। লগ ইন করুন: www.facebook.com/eisamay.com